بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২রা জুলাই, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণের ধারা জারি রাখেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজকাল হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে, আজও একই বিষয়ে কিছু বর্ণনা করব। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে হযরত উমর (রা.)'র মহানুভবতা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত উমর (রা.) খলীফা হবার পর জানতে পেরেছিলেন যে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আরব উপদ্বীপে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই বসবাস করবে। ইয়েমেন মুসলমানরা জয় করেছিল এবং নীতিগতভাবে ইয়েমেনের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের মালিকানাধীন ছিল; ইয়েমেনের পৌত্তলিক, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কর প্রদানের শর্তে সেখানে বসবাস করত। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালনার্থে হযরত উমর (রা.) ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অন্যত্র চলে যেতে বলেন, কিন্তু ইয়েমেনের জমি তিনি ন্যায্য মূল্যে তাদের কাছ থেকে কিনে নেন। সহীহ্ বুখারীর ভাষ্য ফাতহুল বারীতে এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যদিও নীতিগতভাবে রাষ্ট্র সেসব জমির মালিক ছিল, তদুপরি হযরত উমর (রা.) তা তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক দখল করেন নি, বরং ন্যায্য মূল্যে তা ক্রয় করেন। এটি তাঁর মহানুভবতা ছিল। কুরআন শরীফের সূরা আনফালের ৬৮নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, **'নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া কাউকে বন্দী করা বৈধ নয় এবং এরূপ যুদ্ধবন্দী ছাড়া কাউকে দাস বানানো অসঙ্গত'**। একবার ইয়েমেনবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল হযরত উমর (রা.)'র কাছে এসে অভিযোগ করে যে, ইসলামপূর্ব যুগে খ্রিস্টানরা তাদেরকে কোন যুদ্ধ ছাড়াই দাস বানিয়েছিল। যদিও ইসলামের পূর্বে খ্রিস্টানদের কৃত এই অন্যায়ের কোন সমাধান করতে হযরত উমর (রা.) বাধ্য ছিলেন না, কিন্তু তিনি একান্ত মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তিনি বিষয়টি যাচাই করবেন; তাদের বক্তব্য সত্য হলে— তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হবে। অথচ ইসলামের প্রতি আপত্তি উত্থাপনকারী ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা খুব ভালোভাবেই জানে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেও খোদ ইউরোপে এভাবে বিনা যুদ্ধে ক্রীতদাস বানানোর প্রচলন ছিল।

জনগণ ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি হযরত উমর (রা.)'র গভীর ভালোবাসা এবং তাদের জন্য আত্মত্যাগের একটি উদাহরণ হুযূর খুতবায় তুলে ধরেন। একবার হযরত উমর (রা.)'র যুগে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; মদীনা ও তৎসংলগ্ন এলাকার মাটি অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে ছাইবর্ণ ধারণ করে, যার কারণে সেই বছরটির নাম হয়ে যায় **'আমুর রামাদা'** বা ছাইয়ের বছর। এটি ১৮শ হিজরীর ঘটনা। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে শুরু করে। হযরত উমর (রা.) তখন মিসরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আ'স-এর নিকট পত্র প্রেরণ করে ত্রাণ-সাহায্য পাঠাতে বলেন। হযরত আমর উটের বিরাট এক কাফেলা খাদ্যশস্যসহ প্রেরণ করেন, ইরাক এবং সিরিয়া থেকেও ত্রাণ-সামগ্রী আসে। হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম বেদুইন বা গ্রামবাসীদের কাছে ত্রাণ প্রেরণ করেন, তারপর মদীনাবাসীদের জন্য ত্রাণ বন্টনের ব্যবস্থা করেন; তাঁর নিজের বাড়িতেও বিশালাকারে খাবার রান্নার আয়োজন করা হয় এবং ঘোষণা করিয়ে দেয়া হয়— যে চায় সে এসে এখানেও আহার করতে পারে, চাইলে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খাবার নিয়েও যেতে পারে। দুর্ভিক্ষের কারণে আশপাশের অঞ্চলগুলো থেকেও মানুষজন মদীনায় চলে

আসতে থাকে; তাদের জন্যও সরকারিভাবে খাদ্য বন্টন করা হতে থাকে। হযরত উমর (রা.) স্বয়ং জনসাধারণের সাথে বসে খেতেন; তাঁর নির্দেশে আগতদের সংখ্যাও গণনার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত উমর (রা.)'র সাথে যারা আহার করতেন তাদের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত ছিল; আর যারা আসতো না কিন্তু মদীনায় অবস্থানরত ছিল এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের জন্য খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হতো, তাদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ হাজারের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর (রা.) জনগণের এই বিপদ দূর হওয়ার জন্য একনাগাড়ে রোযা রাখতে শুরু করেন। ঘটনাচক্রে এই দুর্ভিক্ষ চলাকালে তিনি দুর্ভিক্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং মানুষের স্বচ্ছলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত মাংস বা ঘি না খাওয়ারও সংকল্প করেন, যার ফলে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ হজমের সমস্যায়ও ভোগেন এবং অনেক শুকিয়ে যান; এমনকি তাঁর গায়ের রং ফর্সা থেকে কাল হয়ে যায়। অবশেষে এক ব্যক্তির স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত উমর (রা.) খরার প্রকোপ থেকে মুক্তির জন্য ইস্তিসকার নামায পড়ানোর ঘোষণা দেন। নির্ধারিত দিনে তিনি হযরত আব্বাস (রা.)-কে সাথে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে নামায পড়েন এবং নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, **'হে আল্লাহ্, তোমার নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় যখন খরা হতো, তখন আমরা তোমার নবীর দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করতাম আর তুমি তখন বৃষ্টি বর্ষণ করতে। আজ আমরা তোমার কাছে তোমার নবী (সা.)-এর চাচার দোহাই দিয়ে দোয়া করছি; তুমি এই খরার অবসান ঘটাও এবং বৃষ্টি বর্ষণ কর।'** অতঃপর মানুষজন নামায শেষ করে নিজেদের বাড়িতে ফেরার আগেই তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়।

হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ ও কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয়, তবে তিনি মসজিদের নির্মাণশৈলী ঠিক সেরকমই রাখেন যেমনটি তা মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল। ইতোপূর্বে মসজিদে নববীতে চাটাই বিছানোর প্রচলন ছিল না; হযরত উমর (রা.) মুসল্লীদের সুবিধার্থে মসজিদে নববীতে চাটাই বিছানোর প্রচলন করেন। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে আদমশুমারিরও প্রচলন করা হয়, এবং এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল সবার জন্য রেশন-ব্যবস্থা চালু করা এবং রেশনের সুষম বন্টন।

হুযূর (আই.) এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন, যেখানে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব ও সাম্যের শিক্ষা তুলে ধরেছেন। সম্পদের সুষম বন্টন ও সবাইকে সম্পদের অংশীদার বানানোর কাজ ইসলাম কীভাবে সম্পন্ন করেছে তা মহানবী (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের পরের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাতে দেখা যায়। মহানবী (সা.) হিজরতের পর মক্কার মুহাজির, যারা সবকিছু মক্কায় রেখে কপর্দকহীন অবস্থায় এসেছিলেন— তাদের সাথে মদীনার আনসারদের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন; আর আনসাররাও মহানন্দে নিজেদের সম্পদ ভাইদের সাথে সমান অর্ধেক করে ভাগ করে নেন। যদিও মুহাজিররা তাদের এই সম্পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেন, কিন্তু তাতে আনসারদের আত্মত্যাগকে কোনভাবেই খাটো করে দেখা সম্ভব না। আর ইসলামের প্রতিষ্ঠিত এই সাম্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই।

এভাবে দীর্ঘদিন চলার পর যখন আবার সম্পদে বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং একটি যুদ্ধের সময় দেখা যায় যে, সবার কাছে খাবার নেই, তখন মহানবী (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রেই নির্দেশ দেন— সবার খাবার একস্থানে জড়ো করে সবাইকে সেখান থেকে রেশন আকারে খাবার দেয়া হোক; এভাবে তিনি (সা.) নিশ্চিত করেন, কেউ

যেন অভুক্ত না থাকে, সবাই ন্যূনতম চাহিদা অনুসারে খাবার পায়। অর্থাৎ যখন প্রয়োজন হয় নি তখন সাধারণভাবে সবকিছু চলতে দেয়া হয়েছে; কিন্তু যখন সংকট দেখা দেয়, তখন ইসলামী রাষ্ট্র সমবন্টনের ব্যবস্থা করেছে। মোটকথা, মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে এসেছে। সেই সময় পর্যন্ত তো ইসলাম একটি সীমিত গণ্ডির ভেতরেই ছিল এবং মুসলমানরা একটি নির্দিষ্ট জাতির লোক ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইসলাম দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হতে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন জাতির লোক মুসলমান হতে শুরু করে, তখন তাদের সবার জন্য অন্নের সংস্থান করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই হযরত উমর (রা.) আদমশুমারির ব্যবস্থা করেন এবং সবার জন্য রেশনের ব্যবস্থা চালু করেন ও এর সুষম বন্টন নিশ্চিত করেন। যখন রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পূরণের ব্যবস্থাগ্রহণ করে, তখন আর কোন বীমা ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে না। আজ একথা বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সমাজতন্ত্র সর্বপ্রথম সব নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের কাজ করেছে; এটি ভুল, কেননা ইসলাম দেড় হাজার বছর পূর্বেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তা বাস্তবায়নও করে দেখিয়েছে।

হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করেন। ২০ হিজরী সনে তিনি তখন পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামী রাষ্ট্রকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করেন; প্রদেশগুলো ছিল- **মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, জাযিরা, বসরা, কূফা, মিসর ও ফিলিস্তিন**। তাঁর খিলাফতকালেই মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনাও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং সুসংগঠিত হয়। হযরত উমর (রা.) শূরায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতেন, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রে। তিনি কর্মকর্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও দিকনির্দেশনাও প্রণয়ন করেন যেন তারা কেউ জাগতিকার চর্চা শুরু না করে বা অহংকারী ও উদ্ধত না হয়ে ওঠে। দায়িত্ব লাভের পর জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করে কর্মকর্তারা যেন সম্পদের পাহাড় গড়তে না পারে এজন্য তিনি তাদের ব্যক্তিগত সহায়-সম্পতির প্রতিও কড়া দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করেন। হযরত উমর (রা.)'র আরও একটি যুগান্তকারী কাজ হল, কৃষিকাজের উন্নতির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ। ইরাক ও সিরিয়া জয়ের পর হযরত উমর (রা.) সেখানকার বাসিন্দাদের তাদের জমিজমা ফিরিয়ে দেন, যা ইতোপূর্বে অমুসলিম রাজা-বাদশাহ্‌রা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের আমীর-ওমরাদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিল। হযরত উমর (রা.) নিয়ম করে দেন, আরবগণ সেসব দেশে গিয়ে নিজেরা চাষাবাদ করতে পারবে না, বরং স্থানীয়রাই চাষাবাদ করবে। খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যেন বিধর্মী প্রজাদের পক্ষে কর প্রদান কষ্টকর না হয় এবং তাদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করা না হয়। কৃষিকাজের উন্নতি এবং এক্ষেত্রে জনগণকে উৎসাহিত করার মানসে তিনি আরও ঘোষণা করেন— যেই অনাবাদি সরকারি জমিতে কেউ চাষাবাদ করবে, সেই জমির মালিকানা সে লাভ করবে। হযরত উমর (রা.) নিজ খিলাফতকালে এরূপ আরও অনেক জনহিতকর কর্মকাণ্ডের প্রচলন করেন। হুযূর (আই.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণের ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) www.ahmadipedia.org নামক একটি নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধনের ঘোষণা দেন, যা হুযূর জুমুআর নামাযের পর উদ্বোধন করেন। এটি মূলত একটি আহমদীয়া এনসাইক্লোপিডিয়া, যেখানে আহমদীয়া জামাত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত থাকবে এবং তাতে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় ও তথ্য খুঁজে বের করারও সুযোগ রয়েছে। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল,

উপযুক্ত প্রমাণাদি ও যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে এতে নতুন তথ্য সংযোজন করারও সুযোগ থাকবে এবং এতে সন্নিবেশিত তথ্যের পরিবর্তন করারও সুযোগ থাকবে; তাছাড়া কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে কোন বিষয় সন্নিবেশিত করার জন্য আবেদনও করা যাবে। কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ, আর্কাইভ বিভাগ ও রিসার্চ সেলের সদস্যদের নিরলস চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই কার্য সমাধা হয়েছে; হুযূর (আই.) তাদের উত্তম পুরস্কার লাভের জন্য দোয়া করেন। (আমীন)

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]